আগরতলার বইমেলায়

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

বই> বহি> ওহি-'বই' কথাটা আরবি 'ওহি' শব্দ হতে উদ্ভূত। 'ওহি'র মধ্যে আক্ষরিক থেকে মরমি নানা অর্থচ্ছটা রয়েছে। এর এক অর্থ প্রেরণা। কে কোথা থেকে প্রেরণা পায় বা প্রেরণা কখন কোথা থেকে আসে বলা মুশকিল। প্রেরণা একই সঙ্গে এক অস্থিরতা ও সৃষ্টির জন্ম দেয়। বাংলায় একটা কথা আছে, লেখার কিল ভূতে কিলায়। আবার যার সাধ্য নাই অথচ লেখার বাসনা রয়েছে তার সম্পর্কে লোকে রহস্যচ্ছলে বলে, 'কলাপাতা না এগুতেই পুঁথি লেখার সাধ।'

বইপদবাচ্য হতে হলে একটি গ্রন্থনায় ন্যূনতম কত পৃষ্ঠা থাকতে হবে সে সম্পর্কে জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিবিষয়ক সংগঠন একটা নির্দেশনা দিয়েছে। সাময়িক নয় এমন একটা মুদ্রিত প্রকাশনা, যার মলাট-প্রচ্ছদ ছাড়া ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা রয়েছে তাকে বই হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। 'বই'-এর এই সংজ্ঞা পরিসংখ্যানের নিমিত্তে কিছু প্রয়োজন মেটালেও তা তেমন সন্তোষজনক নয়। মেকআপ-এর কারসাজিতে পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠাকে ঊনপঞ্চাশ পৃষ্ঠা পার করানো যায় বৈ কি?

কালি কলম মন-তিনজন মিলে বই লেখে। লিখন কাগজ এবং মুদ্রণ-এই তিনজনে বই প্রকাশ করে। প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বে কাগজের জন্ম হয় চীন দেশে। তুর্কিদের আগমনের পর এ দেশে কাগজের ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। মুদ্রণও প্রথমে চীনে উদ্ভাবিত হয় কিন্তু তেমন বিস্তার লাভ করেনি। ইংরেজ আমলে ১৭৭৮ সালে সর্বপ্রথম হুগলিতে ছাপাখানার জন্য বাংলা হরফ ঢালাই করা হয়। এখন ডেস্কটপের বদৌলতে ঘরে বসে বই লেখা ও প্রকাশ করা দু-ই সম্ভব। হাতে লেখা কোরানের কদর ছিল বেশি এবং তা পুণ্যকর্ম হিসেবে বিবেচিত হতো। খলিফা ১৮২৫ সালে প্রথম কোরান মুদ্রণের অনুমতি দেন।

বই প্রকাশনা একটা ব্যবসা। টাকার প্রভাবকে ছোট করে দেখা যায় না। প্রকাশক তো ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে পারবেন না। প্রকাশকদের বিনিয়োগ করতে অনেক ঝুঁকি নিতে হয়, এটা মনে রাখতে হবে। বেশির ভাগ প্রকাশকের পাঠ্যপুস্তকের বাজারের দিকে লক্ষ্য। 'বই চালানো' বা 'বই ধরানো'-র জন্য নানান প্রয়াস। প্রকাশকের বিরুদ্ধে লেখকের ক্ষোভ সর্বদেশে। লেখকদের ক্ষোভের কারণ, প্রকাশকরা প্রায়ই কত বই ছাপা হয়েছে তা খোলাসা করে বলতে ইতস্তত করেন। অনেক সময় দাদন দিয়ে প্রকাশকরা গরিব লেখকদের বাঁচিয়ে রাখেন। যে লেখকের বইয়ের জোর-কাটতি তিনিই কেবল অগ্রিম চাইতে পারেন। একটি বইয়ের প্রথম সংস্করণ আমরা সাধারণত সাড়ে বারো শ কপি ছাপাই। উন্নত দেশে কোনো প্রকাশকের কাছে এ ধরনের মশকনিধন উদ্যোগ তেমন আকর্ষণীয় হবে না। সেসব দেশে হাজার হাজার কপি বই ছাপানোর জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করা হয়।

অন্যান্য আইন-যেমন, কপিরাইট আইনও তেমন মান্য করা হয় না। লেখকরা কপিরাইট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে নিজেদের লেখকস্বত্ব রক্ষার জন্য নিবন্ধীকরণের তেমন কোনো চেষ্টা করেন না। এ ব্যাপারে আইনের আশ্রয় নেওয়া বেশ ঝকমারি। লেখকরা তেমন উৎসাহিত বোধ করেন না। কপিরাইট লঙ্ঘন রোধে উন্নত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে অত্যন্ত তৎপর।

বই কেনা, বই ধার করা এবং বই মেরে দেয়া-বই যোগানোর এই ত্রিবিধ পন্থা বহু পুরাতন এবং পরীক্ষিত। যিনি স্বভাবে চৌর্যোন্মাদ, ভূতের মারের ভয়ে হয়তো তিনি মহাবিদ্যার আশ্রয় নেন। তাঁকে না হয় আমরা একটু বা নেহাই করলাম। লেখক ও প্রকাশকদের জন্য বড় সুখবর ও আনন্দের কথা যে, বই কেনার প্রতি ইদানীং আগ্রহ বেড়েছে।

মূর্খ লোকে কিনে বই, জ্ঞানী লোকে পড়ে, ধনবানে কিনে ঘোড়া বুদ্ধিমানে চড়ে-এই পুরনো প্রবাদ একটু ফিকে হয়ে গেছে।

সমাজের অল্পসংখ্যক শিক্ষিত লোকের ওপর ভরসা করে যাঁরা প্রকাশনা পেশা ধরে রেখেছেন তাঁদের সাধুবাদ জানাতে হবে। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে প্রকাশনা-ব্যবসার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। আপন স্বার্থচিন্তায় প্রকাশকরা সাক্ষরতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিছু উদ্যোগ নিলে সকলের জন্য তা বড় মঙ্গলময় হবে।

ফ্রান্সিস বেকন বইয়ের তিন রকম রকমভেদ করতেন : কিছু বই আছে চেখে দেখার, কিছু বই আছে গিলে ফেলার এবং কিছু বই আছে চিবিয়ে চিবিয়ে পড়ে হজম করার। 'বই' ও 'ভালো বই' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যবিচার : 'বই জিনিসটা ভাবপ্রকাশ ও রক্ষার একটা আধার মাত্র। কিন্তু অনেক সময় সে-ই নিজে সর্বেসর্বা হইয়া ওঠে। তখন সে বই পড়িয়া মনে হয় এ কেবল বই পড়িতেছি মাত্র। এগুলো কেবল লেখা। ভালো বই পড়িবার সময় মনে থাকে না বই পড়িতেছি, ভাব ও তত্ত্বের সহিত মুখোমুখি পরিচয় হয়, মধ্যস্থতা পদার্থটা চোখেই পড়ে না।'

বয়সভেদে পাঠকের কৌতূহল। আবার পাঠকেরও মৃত্যু হয়। একসময়কার সাড়াজাগানো বই পরবর্তীকালে পাঠকের কাছে অসার ও নিঃসাড় মনে হতে পারে।

'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' লেখার বছরদুয়েক পরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'লাইব্রেরি' প্রবন্ধে এক নীরব মহাশব্দের উল্লেখ করেছেন যার মাঝে মানুষ আপনার পরিত্রাণকে বাঁধিয়ে রেখেছে : 'মহাসমুদ্রের শত বছরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমাইয়া পড়া শিশুটির মতো চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই লাইব্রেরির তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, প্রবাহ স্থির হইয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোক কালো অক্ষরের শৃঙ্খলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। ইহারা সহসা যদি বিদ্রোহী হইয়া উঠে, নিস্তব্ধতা ভাঙিয়া ফেলে, অক্ষরের বেড়া দগ্ধ করিয়া একেবারে বাহির হইয়া আসে! হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন বরফের মধ্যে যেমন কত কত বন্যা বাঁধা আছে, তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে মানবহৃদয়ের বন্যা কে বাঁধিয়া রাখিয়াছে!

'বিদ্যুৎকে মানুষ লোহার তার দিয়া বাঁধিয়াছে, কিন্তু কে জানিত মানুষ শব্দকে নিঃশব্দের মধ্যে বাঁধিতে পারিবে! কে জানিত সঙ্গীতকে, হৃদয়ের আশাকে, জাগ্রত আত্মার আনন্দধ্বনিকে, আকাশের দৈববাণীকে সে কাগজে মুড়িয়া রাখিবে! কে জানিত মানুষ অতীতকে বর্তমানে বন্দি করিবে! অতলস্পর্শ কালসমুদ্রের ওপর কেবল এক একখানি বই দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিবে!

'লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার ওপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোনো পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোনো পথ মানবহৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।'

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে আমরা লক্ষ করি প্রখ্যাত প্রশাসক শিক্ষিত ছিলেন বা শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং দক্ষহস্তে গ্রন্থাগার বা কুতুবখানার দেখভাল করতেন। শাসন বা শোষণ করতে হলে বিদ্যা অপরিহার্য।

এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেখানে ছেলেমেয়েদের বই পড়ে শোনানো হয় এবং যে ছেলেমেয়েরা তাদের বাপ-মাকে বই পড়তে দেখেছে তাদের লেখাপড়া শুরুতেই বেশ ভালো হয়।

আজকের তথ্যযুগে মুভি, টিভি ও ইন্টারনেটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বইয়ের ব্যবসা লাটে উঠতে পারে-নিরাশাবাসীদের এমন দুশ্চিন্তার মুখে ছাই দিয়ে বইয়ের ব্যবসা সদর্পে টিকে আছে। কম্পিউটারের স্ক্রিনে চিকিমিকি লেখার চেয়ে সাদা কাগজে কালো আখর যেমন আমাদের নয়ন জুড়ায় এবং মরমে পশে, তার আর তেমন জুড়ি নেই।

পাঁচ দিন আগে একুশে ফেব্রুয়ারি আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করলাম। একটা দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এ-এক পরম অহঙ্কার যে, সেই দেশবাসীর কল্যাণে বর্ষপঞ্জির একটা দিন আজ সারা দুনিয়ায় বিশেষ মর্যাদাসহকারে পালিত হচ্ছে। আমি এক ছোট্ট কবিতায় একুশে ফেব্রুয়ারিকে দুনিয়ার মজদুরদের মে-দিবসের সঙ্গে তুলনা করি। মে দিবস যেমন, একুশে ফেব্রুয়ারি তেমনি সকল মানুষের জন্য। সেই জন্মলগ্ন থেকে আমাদের ভাষা আন্দোলনে কোনো ভাষাবৈরিতা ছিল না। সমকালীন প্রগতিবাদী চিন্তাধারার দ্বারা আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম। তৎকালীন পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রগতিবাদী আমাদের ভাষার সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেন। আমরা চেষ্টা করছি দেশের কুড়িটি মাতৃভাষার যেন উন্নতি হয় এবং প্রত্যেকে স্ব স্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে যেন শৈশব-কৈশোরে বিদ্যাচর্চা করতে পারে। আমার কাছে এ এক বড় আনন্দের কথা যে ত্রিপুরায় বাংলাভাষী এবং অ-বাংলাভাষী সকলেই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষারম্ভ করতে পারছে। আজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভের অধিকার মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। ‘স্বদেশ স্বদেশ করিসরে ভাই এদেশ তোদের স্বদেশ নয়’-এমন মন খাঁ-খাঁ করা হাহাকার যেন কোনো গোষ্ঠীর কারো মনের মধ্যে না জাগে তার জন্য আমরা তৎপর থাকব-এমন অঙ্গীকারের জন্য ত্রিপুরার আগরতলা এক প্রশস্ত স্থান। বিশ্বায়নের রথের তলায় কোনো জনগোষ্ঠী যাতে গুঁড়িয়ে না যায়, তার জন্যই আজ মানবাধিকার এবং সংস্কৃতির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন উঠেছে। কোনো সংস্কৃতি যেন ফসিল বা জীবাশ্মে পরিণত না হয় বা নৃতত্ত্ববিদের কেবল যেন কৌতূহলের বিষয় না হয়।

ককবরকভাষী ভাই ও বোনদের জন্য আমার বক্তব্যের কিছু পুনরুক্তি :

ককবরক সানাই তাখুকবুখুকরগ, সালবা সীকাং ২১ ফেব্রুয়ারি চুং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা সাল পালাইখা। কাইসা বিগ্রা চাসানা নাই তংনাই দেশনি থানি’খা ওয়ারনা কক অম-ন’ আ দেশনি দারাতুই-ন বদরনি সালসা সারা দুনিয়াঅ বরম রুউই পালাইয়জাগে’। আঙ ককলব বীসাতে কাইসাঅ ২১ ফে ব্রুয়ারীন’ দুনিয়ানি মজদুর রগনি মে সাল বাই তুলনা রুঅ। মে সাল আহাই-ন ২১ ফেব্রুয়ারীর জত’ বরকনি বাগুই। সংচাজাকদ্রপনি সিমি-ন চিনি ভাষা আন্দোলন’ কুনু ককন’ নাম্লেমা কুরুই। আ জরানি প্রগতিবাদী ওয়ান উানসকমুং বাই চুং বেং জাকমানি। আফ্রুনি পাকিস্তান্নি জুদা প্রগতিবাদী মত মানিনাইরগ চিনি তাষানি সংগ্রামে। খা গথকরীঅ। চুং নাইখা দেশনি ২০টা মানি ককনি উন্নতি অংথুং তাই জত-ন জানি জানি মানি কক বাই চেরাই ফুরু পরিউই মানথুং। অম’ সতনুই-ন তংথকনা কক ত্রিপুরাঅ বাংলা সানাই তাই বাংলা সায়া জত-ন মানি কক চাই সুরুংমা চেংগুই মানো। ‘সাকনি দেশ সাকনি দেশ হো হীন’ জত-ন তাখুক অ দেশ নিনি দেশ য়া’-অমতুই খা খামনাই তংমুং কুনু বসংনি বিসিং তা কাসাথু-অমতাই ককনি বাগুই ত্রিপুরানি আগরতলা জাগা কুউার কাইসা। বিশ্বায়ননি রথনি তলাঅ কুনু বসং ফেরজাক য়াতুই, বনি বাগুই-ন তিনি মানবাধিকার তাই হুকুমুনি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারনি কক কাসাঅ। কুনু হুকুম ফসিল এবা মাংথাপ্পা চায়াতুই এবা নৃতত্ত্ববিদ্‌নি নায়তুকজাগনাই সিমি অংয়াতুই।

[ককবরকের অনুবাদ কবি শ্যামলাল দেববর্মার সৌজন্যে]

আজ আমি দ্বিতীয়বারের মতো আগরতলায় এসেছি। বছরদুয়েক আগে এসেছিলাম আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে ত্রিপুরায় বাংলভাষার কী অবস্থান তা দেখার জন্য। এবার ২৩তম আগরতলা বইমেলায় আমাকে ও আমার সহযাত্রী অধ্যাপক মেজবাহ কামালকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাদেরকে আবারও কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করলেন ত্রিপুরাবাসী। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ত্রিপুরার সকল জাতির মানুষ মুক্তিযুদ্ধে আমাদের যে সহায়তা দান করেন তা কোনো দিন ভুলবার নয়। এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় সমানসংখ্যক শরণার্থীকে আপনারা এক রাজনৈতিক মহাদুর্যোগের সময় আশ্রয় দেন এবং নানাভাবে আমাদের সাহায্য-সহায়তা দান করেন। দুর্গত মানুষের প্রতি অনুকম্পায় এই সাহায্য এতই স্বতঃপ্রণোদিত ও স্বাভাবিক ছিল যে সেই আকস্মিক শরণার্থীদের ঢলে কোনো বিষময় প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। সেদিন আমাদের জন্য আপনারা নিজেদের বিপদের মুখে ঠেলে দেন। যে জনগোষ্ঠী এত

বড় ঝুঁকি নিতে পারেন. তাঁর ঔদার্য, দাক্ষিণ্য ও মহানুভবতা সকল মানুষের জন্য এক মহাদৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সেই বিপদের সময় যে রাখিবন্ধন ঘটেছিল তা স্মরণ রেখে আমরা এক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনে ব্রতী হব। এ রাজ্যের সকল মানুষের প্রতি এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যে এই উপত্যকার অশ্বারোহীদের প্রতি আমার শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। আপনারা ভালো থাকুন। অশেষ ধন্যবাদ।

২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৫ আগরতলা ২৩তম বইমেলায় উদ্বোধকের বক্তব্য।